OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 378 - 384
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : অরণ্যকথায় 'আরণ্যক'

ড. শ্রীকান্ত কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার
Email ID : srikantakarmakar05@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bibhutibhushan Bondhyopadhyay, Aranyak, Bihar, Aranyajibon.

Abstract
Bibhutibhushan Bandyopadhyay is one of the best nature-loving writers in Bengali literature. One of the examples of his love for nature is 'Aranyak'. 'Aranyak' is written on the besis of his experience living in Bihar. This novel satisfies the author's hunger for love of nature. Along with nature, the people of here, their culture, religion, food and drink, sorrows and hardships all appear before us as a living document. By reading 'Aranyak', we can reach the remote forest land of Ismailpur, fifteen miles away from Bhagalpur, Bihar. It depicts the landscape of Ismailpur, Narha, Boihar-Lobtulia, Mohanpura of hundred years ago. The first part of the essay has tried to talk about the culture there. The second part has highlighted the socio-economic context and the last part has tried to portray the nature, visualised by the author.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বিভূতিভূষণ। তাঁর 'আরণ্যক' আমাদের সামনে মেলে ধরে সাহিত্যের একটা অন্য জগত। উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৩৯-এ। ১৯৩৯ সালে 'আরণ্যক' প্রকাশিত হলেও এই উপন্যাসের ঘটনা ১৯২৪ সালের জানুয়ারি থেকেই লেখকের স্মৃতিপটে লেখা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৪ সালে জানুয়ারিতে লেখকের বিহার যাওয়ার বারো বছর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালে বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১২ সালের আগে বিহার বাংলার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। প্রকৃতির প্রতিকূলতার জন্য এখানে মানুষের বসতি ছিল কম।

বিভূতিভূষণ ছোট থেকেই প্রকৃতি প্রেমী ছিলেন। ছোট বেলায় যখন তিনি ইস্কুলে যেতেন তখন সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে বন-জঙ্গলে ঘেরা রাস্তা দিয়ে যেতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় হয়েছেন। কলকাতায় কলেজে ভর্তি হয়েছেন। বিএ পাশ করার আগে ১৯১৭ সালে গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯১৮ সালে বিএ পাশ করে এম এ-য় ভর্তি হন। এরপর জীবনে হটাৎ দুঃখ নেমে আসে। পত্নী বিয়োগ হয় তাঁর, কয়েক বছরের ব্যবধানে মা এবং প্রিয় বোন মারা যান।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর যেমন একটা মোহ ছিল তেমন অর্থ কষ্টে জর্জরিত ছিলেন, আর তার সাথে ছিল স্বজন হারানোর ব্যাথা। এই সব কিছুর থেকে মুক্তি দিয়েছিল পাথুরেঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগল পুরের জঙ্গলের ইজারার কাজে যোগ দেওয়া।

উপন্যাসের প্রস্তাবনাতেই লেখক বলেছেন, -

> "সমস্ত দিন আপিসে হাড় ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেষিয়া বসিয়া ছিলাম।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> নিকটেই একটা বাদাম গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদাম গাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ খেলানো জমিটা দেখিয়া হটাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডির ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি।”[১]

লেখকের বিহারের কর্মক্ষেত্রের অবস্থান ছিল ভাগলপুর থেকে পনেরো ক্রোশ দূরে ইসমাইলপুরে। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেনপুর। পূর্ব দিকে ফুলকিয়া, লবটুলিয়া, নাড়াবইহার থেকে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলা পর্যন্ত ইসমাইলপুরের এলাকা। বিরাট অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী ঘেরা এই বিস্তৃত এলাকা। উপন্যাসে এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, গয়া, কিষাণগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার নাম আছে।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ অরণ্যেই বাস করত। মানুষ বর্তমানে অনেক সুযোগ সুবিধা আরাম বিলাসের মধ্যে বাস করে।

> “...প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আমার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম...।”[২]

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সালে ‘স্মৃতি রেখা’য় তাই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন - “এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো – একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।” বিভূতিভূষনের অরণ্য-কথাকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করব – সাংস্কৃতিক কথা, আর্থসামাজিক কথা আর প্রকৃতির কথা।

এই অরণ্য অঞ্চলে আলাদা কোন সংস্কৃতি নেই। এর সংস্কৃতি এক মিশ্র সংস্কৃতি। বিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে এসে বসতি শুরু করেছিল।

> “সদাচারী মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে।”[৩]

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু পার্বনীর কথা পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছট্ পরব। এই এলাকার সব থেকে বড় উৎসব। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় এই পরব। এর পর আমরা দেখি দোল বা হোলি খেলার কথা। আর আছে রাজা দোবরুপান্নার রাজদানীতে ঝুলন উৎসবের কথা। দোবরুপান্নার রাজধানী চকমকি টোলাতে অবস্থিত ঝনঝরি পাহাড়ে খুব ধুমধাম করে ফুলের মালা, ফুলের গহনা পড়ে, মাদলের তালে তালে নাচ গানের সঙ্গে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমে কাছারিতে পালন করা হয় পুন্যাহ উৎসব। এই রকম আরো কিছু পার্বনী বিহারের এই সমস্ত এলাকায় পালিত হয় যাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মেলা বসে। যেমন শিবরাত্রিতে অখিল কুচার মেলা। পৌষ সংক্রান্তির মেলা। মানুষের বিনোদনের একটা সুযোগ আনে এই মেলা। বাইরের জগতের সঙ্গে এখানের মানুষের যোগাযোগ খুবই কম থাকে। এই মেলার দ্বারা কিছু কিছু নতুন নতুন বিলাস সামগ্রীর স্পর্শ পায় এখানের মানুষেরা।

এই অঞ্চলে অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের সাথে সাথে গাঙ্গোতা বা ভুইহার জাতির কথা আছে তার সাথে আছে দোসাদ জাতির কথা। গাঙ্গোতাদের পূজা বা সমাজের ভালো কাজে হাত লাগানোর অধিকার ছিল না। মটুকনাথ নিজে পণ্ডিত তাই দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবকে পুজো করতে বা জল ঢালতে পারবে না। সে সত্যচরণের কাছে নালিস করে বলেছে –

> “একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?”[৪]

উপন্যাসে দোসাদ জাতির প্রসঙ্গে পাটোয়ারী সত্যচরণকে বলেছেন –

> “ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না।”[৫]

লোক দেবতার মধ্যে যাঁর কথা একাধিক বার এসেছে এই উপন্যাসে তা হল ‘টাড়বারো’ লোক দেবতার কথা। বুনো মহিষের দেবতা টাড়বারো। সত্যচরণ গনু মাহাতোর মুখে এই নামটি প্রথম শুনেছিলেন। দ্বিতীয়বার এই নামটি শোনেন দশরথের মুখে। এরপর সত্যচরণ এই টাড়বারোর শিলামূর্তি দেখেন রাজা দোবরুপান্না রাজধানী চকমকি টোলাতে। রাজা দোবরুপান্নাদের কুল দেবতা এই টাড়বারো। জঙ্গলে চোরা শিকারীদের হাত থেকে যে কোনো বিপদের হাত থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহিষদের রক্ষা করে এই টাড়বারো লোক দেবতা। পায়রা আর মুরগি বলি দিয়ে এই দেবতার পূজা করা এই অঞ্চলের একটি বিশেষ রীতি।

উপন্যাসে দুই শ্রেণীর লোক নাচের কথা জানতে পারি এক 'হো হো' নাচ আর দ্বিতীয় 'ছক্করবাজি' নাচ। ধাতুরিয়া ছক্করবাজি নাচে পটু। সে এই নাচ শিখেছিল গয়া জেলার এক গ্রামে ভিটলদাস নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে। ভিটলদাসের সাতপুরুষের এই নাচ পরবর্তী প্রজন্ম শিখতে আগ্রহী নয়। একমাত্র ধাতুরিয়া এই নাচ শিখেছিল।

গনু মাহাতোর মুখে লেখক কিছু কিছু অদ্ভুত কথা শুনেছেন তার মধ্যে হল উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেটে বেড়ানোর কথা। এর সঙ্গে সঙ্গে আছে কিছু কুসংস্কারের কথা। রাজু পাড়ের মুখে শোনা যায় যে সূর্য উদয় পাহাড়ের গুহা থেকে ওঠে এবং পশ্চিম সমুদ্রে অস্ত যায়। রাজু বলেছে –

> "রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিপি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"[৬]

দশ হাজার বিঘা জংলী জমির বিলি বণ্টনের কাজে নিযুক্ত সত্যচরণ। জঙ্গল মহল এই এলাকার মধ্যে আছে ডিহি কাছারি লবটুলিয়া, ফুলকিয়া কাছারি, ডিহি কাছারি আজমাবাদ এবং ইসমাইলপুর। এই এলাকার মানুষের কথা লেখক বলেছেন। তাতে আর্থিক অবস্থার কথা যা ফুটে উঠেছে তা হল এখানের মানুষ খুব গরিব। লেখক নিজেই বলেছেন –

> "শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরিব। এত গরিব তাহা জানিতাম না।"[৭]

সত্যচরণ প্রথমে লবটুলিয়া যান সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় হয়। এরপর ডিহি আজমাবাদ যখন যান তখন সেখানেও মানুষের ভিড় লেগে যায় দূর দূর থেকে মানুষ এসে পৌঁছায় সেখানে। এর কারণ পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করলে পাটোয়ারী বলেছেন –

> "হুজুর, এরা বড় গরিব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়।"[৮]

ভাত খেতে পাওয়াটাকে এরা ভোজের সমান মনে করে। সত্যচরণ বাঙালি বাবু তাই সকলে আশা নিয়ে এসেছিল ভাত খাওয়ার জন্য। এদের খাবারের তালিকায় আছে –

> "খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর জঙ্গলে বথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ আর একটু নুন, এই খায়। ফাল্গুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে - ...সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরিব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।"[৯]

এখানের মানুষ "চীনা ঘাসের দানা, আর নুন, বড় জোর তার সঙ্গে... জংলী গুড়মি ফল-ভাজা, নয়ত বথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুধুল ভাজা"।[১০] মকাই সেদ্ধ কে স্থানীয় ভাষায় বলে 'ঘাটো'। এই জঙ্গলের মধ্যেই থাকে গোড় পরিবার। গৃহকর্তার মুখে শোনা যায় –

> "শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা।"[১১]

জঙ্গলের মধ্যে থাকা এক সাধুবাবা বলেছেন –

> "বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে একরকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়।"[১২]

লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও আছে কাঁচা পেপে শুকনো কুল কেঁদ-ফল পেয়ারা ও বুনো শিম।

এখানে সারাবছর যে সমস্ত ফসলের চাষ হয় সেই ফসল শহর থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে যায়। এখানে আসা ব্যবসায়ীরা একরকম এই সহজ সাধারণ মানুষ গুলিকে ঠকিয়ে নিয়ে নিজেদের মুনাফা করে। এর সাথে সাথে আসে নানান দ্রব্য বিক্রেতারা তারাও সামান্য জিনিসের বিনিময়ে অধিক ফসল তুলে নেয় এদের কাছ থেকে।

এই অঞ্চলে সেই সব মানুষকে বড়লোক হিসেবে দেখা হয় যার বাড়িতে অধিক গরু বা মহিষ থাকে।

> "গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি, যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।"[১৩]

আবার -

> "মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয় – বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।"[১৪]

এই অঞ্চলের অতিথি বরণের রীতির বেশ কিছু নিদর্শন আছে। ঝুলন উৎসবে সত্যচরণ এই এলাকার পুরাতন শাসক রাজা দোবরুপান্নার রাজ্যে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে "শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মশলা"[১৫] দিয়ে অতিথি বরণ করা হয়। হোলির নিমন্ত্রণে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন এলাকার বর্তমান শাসক রাসবিহারী সিং এর বাড়িতে। সত্যচরণ রাসবিহারী সিং এর বাড়িতে পৌঁছালে বন্ধুকের আওয়াজ করে তার অভ্যর্থনা করা হয়। একটা বড় থালায় "আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা ও মিছরিখণ্ড, এছাড়া ফুলের মালা"[১৬] দিয়ে অতিথি বরণ করা হয়। এছাড়াও মহাজন নন্দলাল ওঝার বাড়িতে সত্যচরণ অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দলাল ওঝার বাড়িতে প্রবেশের পর দুবার বন্ধুকের আওয়াজ করে অভ্যর্থনা করা হয়। এরপর সত্যচরণ বলেছেন, -

> "...দশ-এগারো বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল" সেই থালায় রয়েছে "গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, শুষ্ক খেজুর; ...।"[১৭]

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে নেই। জড়িবুটি দিয়ে চিকিৎসা করা একমাত্র অবলম্বন। হাসপাতাল যেটা আছে সেটা পূর্ণিয়া জেলায় যা ৫৫ কিমি দূরে অবস্থিত। পোষাক পরিচ্ছদ তেমন নেই। শীতকালে শীতের বস্ত্র নেই। কলাইয়ের ভূষির ভিতরে থেকে এখানের মানুষ শীত পার করে। নক্‌ছেদী বলেছে –

> "কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই।"[১৮]

এই সব অঞ্চলে লেখাপড়া জানা বা শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। ছাত্র পড়ানোর জন্য টোল খুললে সেই টোলে ছাত্র হয় না। থাকা খাওয়ার সুবিধা পেয়ে কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে টোলে। মটুকনাথ পণ্ডিত উৎসাহের সঙ্গে টোল খুলে খুব নিরাশ হয়েছে। তবে পরে ধীরে ধীরে বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের সংখ্যাও কিছু কিছু বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে গনোরীকেও একটা টোল খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ সত্যচরণের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আছে কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, রাজু পাড়ে। 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে স্থানীয় এক সভা বা মুসায়েরাতে এসেছিলেন। সেখানে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমন্ত্রিত ছিল তার কবিতা শুনে ঈশ্বরীপ্রসাদ খাতির করেছিলেন।

সত্যচরণ বিহারের অরণ্য অঞ্চলে এসেছেন উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শীতকালে। উপন্যাসের পরবর্তী বেশ কিছু পরিচ্ছেদ ঋতুর কথা উল্লেখ করে শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ গ্রীষ্ম, চতুর্থ বর্ষা, পঞ্চম শীতের শেষ, সপ্তম অষ্টম বসন্তকালে। বিহারের শীত সম্পর্কে লেখক বলেছেন –

> "এমন যে শীত এখানে তা না জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম – শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে দিকটা তবুও থাকে এক রকম অন্যকাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন করিতেছে সে পাশে-মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম।"[১৯]

চরম শীতের পর গ্রীষ্মের দাবদাহের এবং জলকষ্টের কথা লেখকের কলমে উঠে আসতে দেখি –

> "...সারা জঙ্গল মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল – সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না – যদি বা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়ে গিয়াছে।"[২০]

এমন পরিস্থিতিতে জঙ্গলের মধ্যে দাবানল লেগে গিয়ে জঙ্গল মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সিপাহিরা ভয়ের সঙ্গে বলে ওঠে –

> "আগ তো আ গৈল হুজুর।"[২১]

আরণ্যকের মধ্যে লেখক বার বার কুশী নদীর কথা বলেছেন যা মহালের পূর্বপ্রান্ত থেকে ৭-৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই কুশী নদী সম্পর্কে জানা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে নেপালে প্রবেশ করেছে তার পর নেপাল থেকে ভারতের বিহার রাজ্যে প্রবেশ করেছে। কুশীকে 'বিহারের শোক' বলা হয়। কারণ এর প্রচন্ড রূপ আছে। সাতটি নদী এই কুশীতে মিলিত হয় তাই একে সপ্তকোশী বলা হয়। কাটিহারের ক্রুসেলাতে এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়। এই কুশী নদী এবং কুশী অঞ্চল নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'কুশী-প্রাঙ্গনের চিঠি' রচনা করেছেন ১৯৬৫ সালে। দুটো মহকুমা ষোলোটা থানা নিয়ে চার হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিরাট কুশী প্রাঙ্গণ। পূর্বে ভাগলপুরের সাথে ছিল পরে সাহারসাকে কেন্দ্র করে আলাদা জেলা হয়। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিহারে অবস্থান করেছিলেন তখন এই এলাকা কুশী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এই কুশী এলাকা তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে - ১. সাহারসা, ২. মধেপুরা, ৩. সুপোল। বিহারের এই অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে কুশী নদী ছাড়াও কারো নদী, মিছি নদী এবং কলবলিয়া নদীর নাম আছে।

এই অরণ্য প্রকৃতির মধ্যে আছে কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ। যেগুলো ভদ্র সমাজে ভিত্তিহীন বা কুসংস্কার মনে হলেও বিহারের নির্জন অরণ্য প্রকৃতিতে এর গুরুত্ব অন্যরকম। বোমাইবুরুর জঙ্গলে ডামাবানু বা জীনপরিদের কথা আছে। এই ডামাবানুর কথা আমীন রামচন্দ্র সিং এবং আসরফি টিণ্ডেল, বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলের মুখে শোন যায়। সাদা কুকুরের রূপ ধরে ঘরের মধ্যে ঢোকে আবার কখনো নারী রূপ ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কোন মানুষ সেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে পরে তার চরম ক্ষতি হয়।

অরণ্য প্রেমের কথা রাজুর মুখে শোনা যায়। সে গাছ কাটার পক্ষে নয়। সে বলেছে –

> "এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভালো জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটেছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার যেখানে চলে সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে।"[২২]

লেখক বিহারের নিসর্গকে চর্মচক্ষেই নয়, অনুভব করেছেন মর্মচক্ষু দিয়েও। প্রকৃতি তাঁর কাছে একটি সত্ত্বা যেন, তার জন্যই তাঁর কলমে উঠে এসেছে –

> "প্রকৃতি তার নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না।"[২৩]

প্রকৃতির রূপের অদ্ভুত সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে সরস্বতী কুণ্ডীর চারিধারে। যেন স্বর্গের উদ্যান। এই প্রকৃতির রূপের পাগল প্রেমী হল যুগল প্রসাদ। বীজ রোপন করে সুন্দর গাছ লাগিয়ে অরণ্য অঞ্চলকে সাজিয়ে তুলেছে। অরণ্য অঞ্চলের রূপ যেন ছবির মত সুন্দর।

এই প্রকৃতির অভিন্ন অংশ এখানের বসবাসকারী মানুষজন। উপন্যাসের এক এক পর্বে এক এক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং তাতে আমরা মুগ্ধ হয়। গনু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা, ধাওতাল সাহু, জয়পাল কুমার, কুন্তা, ধাতুরিয়া, রাজুপাড়ে, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ, নকছেদী ভকত, মঞ্চী, দশরথ, ভানুমতী, দোবরু পান্না, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, গনোরী প্রভৃতি। প্রকৃতির মতোই উদার এবং মুক্ত মনের অধিকারী এই অরণ্য অঞ্চলের মানুষজন। লেখক তাই বলেছেন,-

> "এদেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা – ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এঁদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে – এদের ভালোবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালোবাসাও বড়।"[২৪]

এখানের প্রকৃতির যেমন কোমল এবং বীভৎস দুই রূপ আছে। এখানে সেরকম দুই রূপের মানুষও আছে। কোমল মানুষের পরিচয় আগে দিয়েছি। উপন্যাসের বীভৎস মানুষ রাসবিহারী সিং।

> "এ-অঞ্চলের যত গরিব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরিবকে মারিয়া তাহাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে।"[২৫]

এলাকার পুলিস, সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার সকলেই তার অনুগত থাকেন।

লেখক বিহারের অরণ্য প্রকৃতির প্রতি প্রেম এবং এখানের মানুষের সরল মনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মনের মধ্যে যে গোপন কথা ছিল তা প্রকাশ করেছেন –

> "এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোতস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত – আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম।"[২৬]

সত্যচরণ ভালোবেসেছিলেন দক্ষিণ বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর সংলাপকে।

বিভূতিভূষণ অরণ্য অঞ্চলে এসেছিলেন প্রকৃতির টানে। কিন্তু তিনি যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বা তাঁর উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ। তার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুশোচনা করেছেন। কষ্ট পেয়েছেন এবং প্রকৃতির কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছেন। এই পাপ কার্যের জন্য যে অপরাধ তিনি করেছেন সেই অপরাধ থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়ার জন্যই এই উপন্যাসের সৃষ্টি বলে তিনি জানিয়েছেন –

> "এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।"[২৭]

তারাদাস বন্দোপাধ্যায় 'আরণ্যক' সম্পর্কে বলেছেন, -

> "একটি ধীরলয়ে বয়ে যাওয়া কাহিনী একটি শান্ত বাঁশির সুরের মত পটভূমিকে অবলম্বন করে ক্রমশ পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে সৌন্দর্যোপলব্ধির অমরাবতীতে।"[২৮]

একটি উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণ প্রতিভার গুণে একাধিক দিককে তুলে ধরেছেন আর প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক পৃথক উপন্যাস লেখার যোগ্য। উপন্যাসের কোন অংশই আরোপিত নয়। বড় সজীব। বড় প্রাণবন্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে শিরোনাম অনুযায়ী যা বিশ্লেষিত হল তাতে সর্বাংশে মুগ্ধতা জড়িয়ে আছে, এ-কথা একেবারেই অস্বীকার করার নয়। পাঠক আমরা-র সৌভাগ্য 'আরণ্যক' সর্বার্থেই আমাদের। বিভূতিভূষণের ভাবনা জগতের স্বরূপ সত্যচরণ। সত্যচরণের সঙ্গে চরণ মিলিয়ে আমরাও ঘুরে বেড়িয়েছি অরণ্যপথের অলিগলিতে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯২, পৃ. ৩
২. ঐ, পৃ. ১১৯
৩. ঐ, পৃ. ১৪৫
৪. ঐ, পৃ. ১৪৯
৫. ঐ, পৃ. ২৭
৬. ঐ, পৃ. ১০৪
৭. ঐ, পৃ. ৯
৮. ঐ, পৃ. ১২
৯. ঐ, পৃ. ১৭
১০. ঐ, পৃ. ৪১
১১. ঐ, পৃ. ১০৮
১২. ঐ, পৃ. ১০৯
১৩. ঐ, পৃ. ১১৭
১৪. ঐ, পৃ. ৫৭
১৫. ঐ, পৃ. ১১৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 378 - 384
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. ঐ, পৃ. ৫৭
১৭. ঐ, পৃ. ১৯
১৮. ঐ, পৃ. ৮৫
১৯. ঐ, পৃ. ১৩
২০. ঐ, পৃ. ২২
২১. ঐ, পৃ. ২৬
২২. ঐ, পৃ. ৪৮
২৩. ঐ, পৃ. ৬০
২৪. ঐ, পৃ. ১১৬
২৫. ঐ, পৃ. ৫৬
২৬. ঐ, পৃ. ১৬০
২৭. ঐ, পৃ. ৪
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯২, পরিশিষ্ট-ক, পৃ. ৫